OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 543 - 547
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘চিত্রাঙ্গদা’ : ঋতু ও রবীন্দ্রনাথ

ড. সংহিতা সান্যাল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : samhita.sanyal@adamasuniversity.ac.in

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Chitrangada, Rituparno Ghosh, Rabindranath Tagore, Gender Identity, Transgender Representation, Body and Desire, Queer Storytelling, Love Beyond Gender.

Abstract
This essay explores the intersection of literature, cinema, and gender identity through a comparative analysis of Rabindranath Tagore’s Chitrangada and Rituparno Ghosh’s cinematic interpretation. While Tagore's Chitrangada transitions from a warrior to an ideal woman for love, Ghosh reimagines the character as a metaphor for gender fluidity and the struggle for self-acceptance. In Chitrangada: The Crowning Wish, Ghosh reflects his own journey as a queer artist, transforming Tagore’s narrative into a modern tale of identity and resistance. The essay discusses how literature offers boundless creative freedom, but cinema, bound by audience and market expectations, requires bold reinterpretations. Ghosh uses cinema not merely to retell a story but to challenge gender norms and societal prejudices, especially against homosexuality and trans identities. His film becomes a powerful statement of individuality and emotional truth, pushing beyond traditional binaries of male and female. This reinterpretation marks a significant step in blending mainstream art with marginalized voices.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ বললেন – “আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী।” ঋতুপর্ণ বললেন – “Chitrangada is conditioned to be a man. That’s how she was brought up.” রবীন্দ্রনাথ বললেন – “শুধু এক বরষের জন্যে/ পুষ্পলাবণ্যে/ মোর দেহ পাক তব স্বর্গের মূল্য/ মর্ত্যে অতুল্য।” ঋতু বললেন - “আমি সেক্স চেঞ্জ করে নেব।” একই নাম। একই চরিত্র। শুধু এক কবির নৃত্যনাট্য কখন যেন এক শিল্পীর Crowning Wish হয়ে উঠল। কখন যেন মহাভারতের গল্প একটি মানুষের আমৃত্যু লড়াইকে ভাষা দিয়ে ফেলল। আর তখনই, ‘চিত্রাঙ্গদা’র মতো মূল ধারার সাহিত্য সার্থক সিনেমার একটি শর্ত পূরণ করে ফেলল। যে শর্ত বলে সিনেমা হল ‘Larger than Life.’ যে সিনেমা শেষ পর্যন্ত আমাদের ধুঁকতে থাকা ইচ্ছেগুলো, রাজকীয় ইচ্ছেগুলোকে জিতিয়ে দেয়।

সাহিত্য আর সিনেমার সম্পর্ক বহুকালের। আবার ঘনিষ্ঠও বটে। ‘‘উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচক রিচার্ডসন লিখছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "The connections that exist between literature and film are worth concentrating upon first and most simply because literature and film are near neighbours in many respects and secondly because these two forms of artistic expression appear to be increasingiy dominant in the formation of aesthetic responses."[১]

সাহিত্য হল লেখকের মুক্ত ক্রীড়ার মাঠ। সেখানে তিনি তাঁর কল্পনা এবং বাস্তবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে আকাশে উড়িয়ে দেন। তাদের পিঠে থাকে শব্দের ডানা। আবার তাদেরকে খুঁজে এনে, সযত্নে অবয়ব দেন রূপদক্ষ পরিচালক। সাহিত্যে আমরা ঘটনা পড়ি, পরিচালক তাদের পর্দায় ঘটান। সাহিত্যে যেসব চরিত্রদের মুখ কল্পনায় গড়ে নিই, পরিচালক তাদের বেছে নেন অডিশনে, হাজার লোকের ভীড় থেকে। লেখক লিখে তাঁর লেখা পাঠকের হাতে ছেড়ে স্বস্তি পান। কিন্তু পরিচালক নিজেও একজন পাঠক! তিনি পড়েন, কল্পনা করেন, তারপর তাকেই রূপ-সংলাপ-আবহ-সুর-ভঙ্গিমায় বিশ্বস্ত করে পর্দায় তুলে ধরেন। এখানেই শেষ নয়! লেখক বলতেই পারেন – 'নিজের জন্য লিখছি'। কিন্তু সিনেমা দর্শকের হতেই হবে। সাহিত্যকে বিনোদন বললে অনেকেই রাস্তায় মিছিল নামাবেন, কিন্তু এখন সিনেমা ঘোষিত বিনোদন, ব্যবসা এবং পণ্য! সুতরাং পরিচালকের আরও বড় দায় সিনেমাকে যথাসম্ভব বড় সংখ্যার দর্শক দেওয়া। কাজেই বনগাঁ লোকালের টিয়া বিশ্বাস এবং বালিগঞ্জের রিয়া গুপ্তা - দুজনের জন্য ভেবেই তাঁকে সিনেমা বানাতে হয়। উপরন্তু এখন সময় এগিয়েছে। এখন সাহিত্যনির্ভর সিনেমা মানে শুধু লোকেশন বাছা আর ছবি তুলে যাওয়া নয়। তার জন্য রীতিমত গবেষণা লাগে। সাহিত্যে বলা সময়ের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি - এমনকি দেয়ালে কীসের পোস্টার থাকবে তা নিয়ে পর্যন্ত মাথা ঘামাতে হয়। কিছুদিন আগে একটি দৈনিকে অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস একটি মন্তব্য করেছেন। বলেছেন, সিনেমা এখন 'telling a story with the best technology at your disposal.' সাহিত্যে যতটা কল্পনা, তাকে বাস্তব করে তুলতে এখন হাজার একটা পদ্ধতি। এ যুগে পর্দায় ডাইনোসর দেখে আর কারও মন ভরে না। কে 'E.T.'-র টেকনোলজি নিয়ে চমৎকৃত হবে, যখন অন্তরীক্ষে আধা-মানুষ আধা-এলিয়েনের যুদ্ধ পাওয়া যাচ্ছে! সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলা সিনেমা যদি সব্যসাচীকে ফেলুদা হিসেবে দেখাতে চায়, তবে তার ফটোশপ আর অ্যানিমেশন দুইই প্রয়োজন। না হলে উনার বয়স এসে বাঙালির চিরযুবক এই নায়কের সযত্নরক্ষিত ইমেজে থাবা বসাবে! এই নিখুঁত, ঝকঝকে সিনেমা প্রজন্মে রবিকবির কাজ পর্দায় আনতে গেলে শুটিং-এর বাইরেও কিছু প্রয়োজন। তাদের নাম সাহস, মেধা এবং দূরদৃষ্টি। এদের সমন্বয় সঙ্গ দিলে মহাভারত থেকে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য এক অন্যতর সাবটেক্সট নিয়ে বেরিয়ে আসে। আবার সেই সমন্বয়ই ওই গল্পকে মেলাতে পারে এক অত্যন্ত বিতর্কিত বাস্তবের সঙ্গে। ঋতুপর্ণ রবীন্দ্রনাথকে কোন গভীরে বহন করতেন বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এক অনন্য ভালবাসা ছিল। তাই বরাবরই রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে ভাঙাচোরা করার, খেলা করার প্রতিস্পর্ধা তাঁর মধ্যে আমরা পেয়েছি। 'চোখের বালি'-তে রবিঠাকুর কোথাও ঋতুমতী বিনোদিনীর প্রসঙ্গ আনেননি। অথচ অতৃপ্ত বালবিধবার নিস্ফল ঋতু বোধহয় তার একাকীত্বের যন্ত্রণার সবচেয়ে করুণ প্রতীক। ঋতুপর্ণ দেখিয়েছেন, আশা ও মহেন্দ্রর দাম্পত্যলীলার পাশাপাশিই দেখিয়েছেন। 'নৌকাডুবি'-তে সরাসরি অস্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথ-কৃত উপসংহার। মনের মত পরিণতি দিয়েছেন চরিত্রদের। 'চতুরঙ্গ'-তে বালির ওপর দামিনীর পায়ের ছাপের অনবদ্য ফ্রেম ছেড়ে যাবার ওর চেয়ে বড় চিহ্ন কিছু হয় নাকি? এই ছোটবড় তুলির টানে বার বার ঋতুপর্ণ রবীন্দ্রনাথের অনুসৃজন করেছে। এতটাই নিজের করে পেয়েছিলেন যে না বলা কথাগুলোকে ভাষা দিতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন হয়তো। ঋতুপর্ণের নিজের মতে, সর্বকালীন মেইনস্ট্রিম টেক্সট প্রতিদিনই টুকরো টুকরো নতুন টেক্সট তৈরি করে চলে। সেজন্যেই তাঁর কোনও সাহিত্যনির্ভর সিনেমা মূল গল্পে আটকে থাকেনি। তাঁর জীবদ্দশায় শেষ নিদর্শন 'ব্যোমকেশ বক্সী'। বহুল সমালোচিত। সিনেমা হিসেবে অনেকেরই পাতে দেবার যোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু লক্ষ করতে বলব, কী আশ্চর্য দক্ষতায় তিনি একটি সরল ও একটি জটিল প্রেমের গল্প বুনে গেছেন। গোয়েন্দা গল্পের নায়ক সেখানে মনস্তত্বের রহস্য খোঁজে। চোরাবালি আসলে মানুষের অবচেতন – যাতে অজান্তে অন্য কেউ ঢুকে পড়লে নিয়তি তাকে অতলে টানে। 'চিত্রাঙ্গদা' তাঁর এই সাবটেক্সট-প্রিয়তার চরম প্রকাশ।

সমকামিতা এখন একটি জ্বলন্ত বাস্তব। কোনও সমস্যা না হয়েও সমস্যা, কোনও বিকার না হয়েও অসুখ। বিশেষত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর বিষয়টি নিয়ে বারবার বিতর্ক উস্কে উঠেছে। অনেক আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সমলিঙ্গের মানুষকে দেখে যৌন আকর্ষণ অনুভব করাটা একটি বিশেষ জিনসজ্জার ফসল, ঠিক যেমন আরেকটি বিশেষ সজ্জার ফসল বিষমকাম। তা সত্ত্বেও সমকাম অপরাধ! আগে সমকামীরা উপেক্ষিত হতেন, কিন্তু নিজের জীবনে নিজের মতো করে বাঁচতে পারতেন! ৩৭৭-এর প্রত্যাহারের নির্দেশ তাদের চোর-ডাকাত-খুনি-ধর্ষকের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিয়েছিল। পাশাপাশি এটাও দেখার বিষয় – যেহেতু মানুষ দুটি একই লিঙ্গের, তাঁদের সপ্রেম ঘনিষ্ঠতা সমপ্রেম নয়, সমকাম! সেটা শুধুই যৌনতা, আর সেটা শুধুই নিষিদ্ধ! অথচ কোটি কোটি বিষম যুগল প্রেমের লেশমাত্র না রেখে শুধু শারীরিক চাহিদা মেটায়। অভ্যাসে একসঙ্গে থেকেও যায়। তাদের অনুমোদন সমাজে আছে। আমরা সমকামিতা নিয়ে ঠাট্টা করি, এড়িয়ে যাই, পরিচিত কাউকে এমন দেখলে মুখ লুকোই। ঋতুপর্ণ কী করেন? প্রথমত নিজের জীবনে নিজের এই তথাকথিত প্রান্তিকতাকে উদযাপন করেন। নিজের ইচ্ছেমতো unisex পোশাক বানিয়ে নেন, কাজল পরেন, মাথার চুল ফেলে দেন। স্বরের নম্রতাকে ঢাকেন না। নিজের যৌনচাহিদা কোথাও প্রকট করেননি। কিন্তু যৌন সত্ত্বাটাকে প্রবল দৃঢ়তায় প্রকাশ করেছেন। আর প্রকাশ করেছেন নিজের শিল্পীসত্ত্বা। 'আরেকটি প্রেমের গল্প' মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছবিটি নিয়ে প্রবল আলোচনা শুরু হয়ে যায়। পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় চপল ভাদুড়ির যৌবন এবং অভি-র চরিত্রে ঋতুপর্ণকে নেওয়া মাত্রই ঋতুপর্ণর ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে দর্শক অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। ওই সিনেমায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, প্রেমের কোনও লিঙ্গ নেই। যে কোনও দুটো মানুষের মধ্যে তা হতে পারে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে প্রেম, সখ্য, স্নেহ, বন্ধুত্ব – এই গণ্ডীগুলো সমাজের নির্ধারণ করে দেওয়া। হতেই তো পারে, আপনি ছেলে এবং আপনার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আসলে কামগন্ধহীন প্রেম! আপনার প্রেমিকার জন্য আপনি যা যা করতে পারেন, ওর জন্যেও পারেন! অথচ সেটা মেনে নিতে আপনার আমার অস্বস্তি আছে। কারণ লিঙ্গ এবং যৌনতা নিয়ে একটা রাজনীতি আমাদের সমাজে চলে। যে যৌনতায় কোনও উৎপাদন নেই, সহজ কথায় সমাজ বা রাষ্ট্র নতুন ক্রেতা পেয়ে লাভবান হয় না, তাকেই সমাজ 'অস্বাভাবিক' বলে ত্যাগ করে। যদি প্রশ্ন করেন, বিষম যৌনতাতেও তো একটা দীর্ঘ সময় উৎপাদন থাকে না। ভেবে দেখুন তো প্রাক-বিবাহ বা বিবাহোত্তর পর্বে নিরোধ বিক্রয়কারী কোম্পানিগুলো কী পরিমাণ মুনাফা করে? কিংবা গর্ভনিরোধক ওষুধ, প্রেগনেন্সি কিট প্রস্তুতকারক সংস্থা? একটি সদ্যোজাত শিশুরও প্যাম্পারস বা মামাআর্থের তেল লাগে। তাই সে-ও ক্রেতা। সেও সমাজে বিচরণের যোগ্য। কিন্তু সমপ্রেমের ফসল নেই। যে সময়ে সিনেমা বানাচ্ছেন ঋতু, সে সময়ে এ এমন এক প্রেম, যা কিছুর চাহিদা রাখে না। শরীর 'তথাকথিত' তৃপ্তি দেয় না, সন্তান আসে না, সংসার থাকে না। শুধু ভালবাসা থাকে। এমন কেনার অযোগ্য তীব্র আবেগ সমাজ সহ্য করবে না। সুতরাং ওদের অপরাধী মার্কা দেওয়া হয়, প্রান্তবাসী করে দেওয়া হয়। ঋতুপর্ণ নিজেই লিখেছেন, -

> "আমার স্বভাবপ্রণোদিত 'অস্বাভাবিকতা' নিয়ে আমি বাস করেছি আমার একাকিত্বের বন্দিজীবনে – আর আমার সামনে ছিল সমাজের এক বিরাট কারাগার। যেখানে ঐতিহাসিকভাবে যে কোনও নতুন প্রথাকেই প্রবেশ করতে হয়েছে দণ্ডিত বিদ্রোহীর মতো, অনেক হিংসা এবং রক্তপাতের মূল্যে।"[২]

এই সিনেমাতে একবারও নিজেকে 'Gay' হিসেবে প্রকট হতে দেননি। এমন একটি মানুষী সত্ত্বা হিসেবে দেখিয়েছেন, যার সম্বল শুধু প্রেম আর শিল্প। তার যৌনতার থেকে অনেক মর্মস্পর্শী তার নিঃশব্দ প্রেমের নিবেদন। ঋতুপর্ণ সফলভাবে এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন, ব্যক্তিগত সাহমত্যের কারণে।

এই ঋতুপর্ণ যখন নিজে ঠিক করলেন নিজের কথা বলবেন, তিনি খুঁজে পেলেন চিত্রাঙ্গদাকে। চিত্রাঙ্গদা – এক আশ্চর্য সমন্বয়ের ধারিকা। এ মেয়েটি জন্ম থেকে নিজেকে পুরুষ-পরিচয়ে চেনে। তার শরীরে লাবণ্য বাড়তে পায়নি কঠোর শক্তিচর্চার শাসনে। তার হাতে অস্ত্রের নিক্কণ। দেহবল্লরী কঠিন বর্মে বাঁধা। সে প্রেমের মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ নিজের ভেতরে মুকুলিত হতে থাকা নারীত্বের অভিঘাত টের পায়। Confused identity নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে, নিজের আরেক আমি-কে খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ বরাবর মেয়েদের ভাষ্যে সাবলীল। অনেকেই মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নারী-মনস্তত্ব খানিকটা জায়গা অধিকার করেছিল। তিনি তাই তাঁর কাব্যে দেখালেন, কিভাবে একজন Tomboy নারী হয়ে উঠল। যেমন নারী হয়ে উঠেছে 'সমাপ্তি'-র মৃন্ময়ী। কিন্তু মৃন্ময়ী গ্রাম্য বালিকা, তাকে সুখে সংসার করতে হবে। তাই সে পতিপ্রিয়া হয়েই থেকে গেছে। তার নারীত্বে আসাটাও স্বাভাবিক এবং মনের নিয়ম মেনে। কিন্তু মার্জিতরুচি রবীন্দ্রনাথ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিত্রাঙ্গদাকে ঠিক লাস্যময়ী নারী হিসাবে রেখে দিতে পারেননি। মহাভারতকে অতিক্রম তিনি চাইলেই করতে পারতেন, সে স্বাধীনতা কবির থাকে। কিন্তু নিজে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসাবে ভাবতে পারেননি বলেই তাঁর অর্জুন নারীর মধ্যে লাস্যের চেয়ে বেশি কিছু খোঁজে। অর্জুন সেই বীরাঙ্গনাকে খোঁজে, যে প্রজাদের রক্ষা করতে যোদ্ধবেশ ধারণ করে। যার অন্তরে মমতা আর বাইরে তেজঃপুঞ্জ। যে নারী যুগে যুগে মনস্বী পুরুষের অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ একটি নারীর গল্প বলেছেন, যে বাহ্যিক নারীত্বকে অস্বীকার করে অন্তরের নারীত্বে মহান। যার যোগ্য প্রেমগুণ পেলে রূপতৃষা ত্যাগ করে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শে যা কল্যাণকর, তাই সুন্দর। তিনি কল্যাণী চিত্রাঙ্গদাকে প্রেমের যুদ্ধ জিতিয়ে দিয়েছেন। হেরে গেছে কাম। এমনকি কামদেব।

ঋতুপর্ণ বললেন অন্য গল্প। 'ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চিত্রাঙ্গদা' রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'-র শরীরে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। 'চিত্রাঙ্গদা' হয়ে ওঠে একটি ইচ্ছের গল্প। এখানে ঋতুপর্ণ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাটের হুবহু চলচ্চিত্র রূপ তো দেনইনি, বরং বর্তমান সমাজজীবন ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে কেবল ইচ্ছের আলোটুকু ফেলেছেন।'[৩] তিনি দেখালেন, কীভাবে একটি সত্ত্বা প্রেমের স্পর্শ পেয়ে আরেক সত্ত্বাকে বেছে নিল। তাঁর চিত্রাঙ্গদা মেয়ে নয়। পুরুষ? Biologically. কিন্তু আসলে পুরুষও নয়। সে একজন মানুষ। রুদ্র-র চরিত্রটাই এমনভাবে গড়া, যাতে তাকে পুরুষ-নারীর ধরাবাঁধা পরিচয়ে মাপা না যায়। সে একজন সক্রিয় মানুষ। যার প্রাণ হল নৃত্যাভিনয়। যে কাজের জায়গায় আশা করে তার দলের ছেলেমেয়ে গভীরভাবে চরিত্রকে বুঝবে। অনায়াসে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মিশিয়ে দেয় উচ্চাঙ্গ সংগীত ও ড্রামস। কে আছে এমন, যাকে এই চরিত্রে মানাবে? কে সে, যিনি সামনে এসে দাঁড়ালে আমরা শুনতে পাবো লিঙ্গ বৈষম্যের রাজনীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা; অথচ যাঁর শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধায় আমরা চুপ? কে আছেন, যিনি একজন ট্রান্সজেন্ডারকে তাঁর যথাযথ আনন্দবেদনায় ধরতে পারবেন? ঋতুপর্ণ নিজে ছাড়া সত্যিই কি কোনও বিকল্প ছিল? রুদ্র হয়ে ঋতু নিজেই এলেন। রুদ্র – নামে প্রচণ্ড পৌরুষ। কারণ তার মা-বাবা ছেলেকে পৌরুষে দেখতে চায়। অথচ রুদ্রের বিভঙ্গে অবলীলায় ফোটে লীলাকমল। তার জীবনে পার্থ এলে তার অঙ্গে বাঁশি বাজে। প্রেমিক পায়ে নূপুর পরিয়ে দিলে তার চোখে জল আসে। প্রেমিকের হাতের বাদ্যে তার পা কথা বলে। তার স্বপ্নদৃশ্যে সরগমে বেজে ওঠে সানাইয়ের সুর। সে নারী হতে চায়। না, নিজের জন্য নয়। সে নারীত্ব চায় তার পুরুষকে যৌনতা দেবে বলে, সন্তান দেবে বলে। রবিঠাকুরের চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের মনোযোগ না পেয়ে লাস্যময়ী হতে চেয়েছিল। কিন্তু রুদ্র পার্থকে পেয়েও নারীত্ব চায়। কারণ পার্থ সন্তান চেয়েছে। পরিপূর্ণ যৌনতা চেয়েছে। এই যৌন নারীত্ব যে প্রকৃত নয়, তা রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছিলেন অর্জুনকে দিয়ে। ভোগে ক্লান্ত অর্জুন প্রকৃত চিত্রাঙ্গদাকে চেয়েছিল। তখন চিত্রাঙ্গদার যে ভাষ্য, তা পুরুষের তৈরি করা নারীসত্ত্বার বিরুদ্ধে প্রকৃত নারীর হুঙ্কার। পিছনে বা সামনে নয়, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অধিকার চাওয়ার ইস্তেহার সেটা। ঋতুপর্ণ কিন্তু সে গল্পে গেলেন না। তিনি দেখালেন, যে নারীত্ব শুধু যৌনতার জন্য, তা biological হলেও আসলে Implant মাত্র। তা মানুষের মৌলিকতার পরিপন্থী, কারণ তা শুধুমাত্র ভোগবাদের ফসল। রুদ্র যখন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে অপারেশন করাচ্ছে, নাচ বন্ধ করে হাসপাতালে শুয়ে আছে, তখন পার্থ নিজের কাম চরিতার্থ করতে রুদ্রেরই হাতে গড়া তার দলের রূপসী মেয়েটিকে বেছে নিচ্ছে। তাকে গর্ভবতী করছে। অ্যাবরশনের টাকা চাইতে আসছে অসুস্থ রুদ্রর কাছে, যে রুদ্রকে এর আগে সে 'synthetic half thing' বলে ব্যঙ্গ করেছে। এই না-পুরুষ না-নারী রুদ্র কিন্তু অনেক বেশি নারীসুলভ হয়ে উঠেছে এই সময়, কারণ পার্থর প্রতি তার মমত্ব, বেদনা, দৃঢ়তা এবং প্রেম এই মুনাফালোভী সমাজে অনেক বেশি প্রকৃত। এতটাই, যে এই প্রেম থেকেই জন্ম নেয় ইমপ্লানটেশন ঝেড়ে ফেলার প্রতিবাদ। এই প্রেম তাকে সাহস যোগায়, বৈষম্যের সমাজে নিজের মতো, লিঙ্গভেদের ওপরে একজন মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার। তাঁর নিজেরই কথায় –

> "যাদের নির্ভর করেই বেঁচে থাকবার কথা ছিল, তারাই যদি স্বেচ্ছায় ঠেলে দেয় গভীর অনিশ্চয়তার দিকে, তবে মরতে মরতেও তো আঁকড়ে ধরতে হবে কোনও না কোনও সম্বল।"[৪]

এই বোধের কাছে একজন মানবশিশুর জন্ম তুচ্ছ। পার্থর বিয়ে তুচ্ছ। তাই রুদ্রের চোখে মদন কোনও দেবতা নন, যৌনপুতুলের জোগান দেওয়া কসমেটিক সারজেন। রুদ্রের নতুন শরীর কোনও বর নয়, নিজেকে বিস্মরণের চিহ্ন। রুদ্র তাই পার্থর নয়নে নয়ন রেখে ফিরে যায় না। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেননি, যখন অর্জুন রূপসী চিত্রাঙ্গদাকে ভোগ করছিল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 61
Website: https://tirj.org.in, Page No. 543 - 547
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তখন তার শরীরের ভেতর আসল রাজকুমারীর মনের কী অবস্থা হয়েছে। ঋতুপর্ণ দেখালেন। হাসপাতালে রুদ্রর বিছানার পাশে পার্থ তার প্রেমিকাকে আদর করেছে, আর রুদ্র প্রাণপণ চোখ বুজে থেকেছে। যাতে পার্থ বুঝতে না পারে। আজকের চিত্রাঙ্গদা তো এই পার্থর কাছে ফিরতে পারে না। রুদ্র ফেরেনি। তার অসুস্থতায় সে এক চিকিৎসকের সান্নিধ্য পেয়েছিল, যে তাকে বন্ধুর মতো দেখত। যে তাকে ইমপ্ল্যান্ট বাদ দিয়ে নিজস্বতায় বাঁচতে উৎসাহিত করত। সিনেমার শেষে যখন রুদ্র ওই চিকিৎসককে খুঁজছে, তখন একবার আমাদের মনে হয়েছে – রুদ্র হয়তো এবার তাকে ঘিরে বাঁচতে শুরু করবে, আবার একই গল্প! কিন্তু ঋতুপর্ণ রুদ্রকে নির্মোহ করবেন। তাই দেখা যায়, আসলে কেউ ছিলই না। ওই চিকিৎসক রুদ্রের অসুস্থতাজনিত সিজোফ্রেনিয়া। তার নিজেরই অস্তিত্বের একটা অংশ নিজের বন্ধু হয়ে, দুখজাগানিয়া হয়ে তাকে সঙ্গ দিয়েছে। রুদ্রের আর কোনও পিছুটান থাকে না। মদনের কাছে রূপের আর্তি শেষ হয় আত্মা ফেরত চেয়ে। অপারেশন থিয়েটারের লাইট জ্বলে ওঠে।

মানুষ নিজের রুচি অনুসারে সাহিত্যের নানারকম অর্থ করে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় চিত্রাঙ্গদা ছিল, আর ছিল মদনের বরপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা। মানুষ নিজেই কুরূপা ও সুরূপা নামকরণ করে চরিত্রটিকে রূপের নিরিখে সাজিয়ে নেয়। আজও একটি কালো মেয়ে ও একটি ফরসা মেয়ে এই দুই চরিত্রে অভিনয় করে। রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কেউ বিকল্প ভাবেনি। ঋতুপর্ণ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তারপর অন্তত দর্শক হিসাবে আমার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমি এই নামকরণকে সমর্থন করি না। আমি 'সমকামী' শব্দটি বলি না। আর আমি নিশ্চিত, অন্তত কিছু মানুষের ভাবনার বন্ধ দরজা তিনি খুলতে পেরেছেন। এর বেশি সিনেমা আর কী করতে পারে? সিনেমার তত্ত্বমতে 'চিত্রাঙ্গদা' যেমনই হোক, সাহিত্যনির্ভর সিনেমার একটি অন্য ধারার পথপ্রদর্শক এটি। যা সাহিত্য ও সিনেমা, দুই বিষয়ে আগ্রহী মানুষকেই চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে। প্রভাবের কথা জানতে চাইবেন? ঠিক জানি না। কীসের প্রভাব কোথায় পড়ে কেউ কি বলতে পারে? তবে এটুকু বলতে পারি – আমার একার নয়, অনেকেরই মানুষটার জন্য কষ্ট হয় খুব। হয়তো তাঁর রেখে যাওয়া লড়াইটা অন্য কেউ শেষ করবেন, সিনেমার ভাষাতেই। সেদিন ঋতুপর্ণর Crowning wish নিয়ে অন্য কেউ একটা লেখা লিখবে। 'The show must go on'.

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিশীথকুমার, 'সাহিত্য ও চলচ্চিত্র', 'বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র প্রথম খণ্ড', নাভানা, ১৯৫৯, পৃ. ১৩
২. ঘোষ, ঋতুপর্ণ, 'প্রথম পুরুষ', সংখ্যা 'ফার্স্ট পার্সন', 'রোববার', সংবাদ প্রতিদিন, ৯ জুন ২০১৩, পৃ. ১৩
৩. https://inscript.me/revisiting-rituparno-ghoshs-chitrangada-the-burning-wish, সঞ্চারী ভৌমিক, ৮ আগস্ট ২০২২
৪. ঘোষ, ঋতুপর্ণ, 'ফার্স্ট পার্সন ১', দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃ. ৮

Bibliography:

'বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্র প্রথম খণ্ড', শ্রীনিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়, নাভানা, ১৯৫৯
'রোববার', সংবাদ প্রতিদিন, সংখ্যা 'ফার্স্ট পার্সন', ৯ জুন ২০১৩
'চলচ্চিত্র ভূত বর্তমান ভবিষ্যৎ', মৃণাল সেন, সপ্তর্ষি, ১৯৭৭
'ফার্স্ট পার্সন ১', ঋতুপর্ণ ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩